দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 JUN 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

ঢাকা: শনিবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৩৯৩: ২৮শে জুন, ১৯৮৬

কৃষি শুমারি

125

পরিসংখ্যান সচিব ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক ডঃ গোলাম রব্বানী বৃহস্পতিবার ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি-শুমারির রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। এতে দেশের কৃষি-পরিস্থিতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য—কৃষি জমির সর্বমোট পরিমাণ, মাথাপিছু জমির পরিমাণ, গ্রামাঞ্চলে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অবস্থা, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য—ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে।

রিপোর্টটি কিন্তু আমাদের উৎফুল্ল করে না। বরং বলা যেতে পারে—এটা নৈরাশ্যকর। দু-একটি ক্ষেত্রে চিত্রটি কিছুটা উজ্জ্বল হলেও সামগ্রিকভাবে তা হতাশাব্যঞ্জক। সবচেয়ে ভয়াবহ যে তথ্যটি ঐ রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে তা হল এই যে দেশে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র সিকি একর। রিপোর্টে একথাও জানা গেছে যে শতকরা ৯ ভাগ পরিবারের বাস্তুভিটেটা পর্যন্ত নেই। এটাও একটি ভয়াবহ তথ্য।

আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণ আমাদের অজানা নয়। ব্যাপক জনসংখ্যা স্ফীতিই এর একমাত্র কারণ। আমাদের দেশটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি ভূখন্ড। তা সত্ত্বেও সুদূর অতীত থেকেই এখানে জনসংখ্যার চাপ ছিল। নানাভাবে নিরুৎসাহিত করা সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো যায়নি। আর এই জনসংখ্যার অধিকাংশই বসবাস করে গ্রামাঞ্চলে এবং পেশায় তারা কৃষিজীবী। ফলে জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ যে সিকি একরে হ্রাস পেয়েছে—এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, জনসংখ্যার এই ভয়াবহ চাপ সত্ত্বেও তা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। ফলে পরিস্থিতি আরো শোচনীয় হতে যাচ্ছে। অচিরেই যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিস্থিতি যথাযথভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব না হয় তাহলে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ যে আরো কমবে তাতে সন্দেহ নেই। আর তার পরিণতি যে ভয়াবহ হবে সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং আমাদের কৃষির অগ্রগতি তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে।

মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে যে শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবিলা করার বিকল্প ব্যবস্থাও উদ্ভাবন করতে হবে। একমাত্র শিল্পই হতে পারে সেই বিকল্প। এব্যাপারে আমরা যে সুপারিশ করতে চাই তাহল এই যে, গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিতে হবে। মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাসের ফলে স্বভাবতই গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সমস্যা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এই সমস্যাটি শিল্পায়নের মাধ্যমে মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের চেষ্টার পাশাপাশি। তবে গ্রামে শিল্পায়ন করতে হলে সেখানে বিদ্যুতায়ন করতে হবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের কৃষির উপর নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। আগে পল্লী এলাকায় কৃষির উপর নির্ভরশীল শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮০ ভাগ। ১৯৮৩-৮৪ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬০ ভাগে।

এটাকে একটা শুভ লক্ষণ বলা যেতে পারে। কেননা যে দেশে কৃষি জমির পরিমাণ অতি নগণ্য এবং জনসংখ্যা বিপুল সে-দেশে জমির উপর নির্ভরতা হ্রাস নিঃসন্দেহে একটা অগ্রগতি। এর ফলে জমির উপর চাপ অন্তত কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে। জমির উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল শ্রমজীবীদের একটা বিরাট অংশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছে, শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়েছে; কেউ কেউ ছোটখাটো ব্যবসায় নিয়োজিত হয়েছে। তবে এদের বিরাট অংশই এসেছে শহরাঞ্চলে এবং নানারকম পেশায় যোগ দিয়েছে। এদের সকলেরই যে উপযুক্ত কর্মসংস্থান হয়েছে—তা নয়, কিন্তু তাদের গ্রামাঞ্চল ত্যাগের ফলে সেখানকার কর্মসংস্থান ও জনসংখ্যার চাপের সমস্যার আংশিক সুরাহা হয়েছে। আমাদের মতে কৃষি জমির উপর শ্রমজীবী মানুষের নির্ভরতা যত কমবে তা ততই মঙ্গলজনক হবে।

কৃষি শুমারি রিপোর্টের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিকটি হল কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ১৯৭৭ সালের পর একই জমিতে চাষের নিবিড়তা শতকরা ১·২ ভাগ থেকে শতকরা ১·৭ ভাগে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা কৃষিক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপক তৎপরতা ও অবিরাম প্রচেষ্টার ফল। কৃষিক্ষেত্রে এই যে সাফল্য—আমাদের কেবল তা টিকিয়ে রাখলেই চলবে না—তা আরো বাড়াতে হবে এবং সুসংহত করতে হবে। বস্তুত একমাত্র এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আমাদের পক্ষে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা সম্ভব।

আলোচ্য কৃষি শুমারি রিপোর্টটি আমাদের কৃষি অগ্রগতি তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করবে। রিপোর্টটি আমাদের জন্য একটি মূল্যবান দলিল এবং আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে তা একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি। কৃষি উন্নয়নে কোন নীতি নির্ধারণ করা উচিত তা নিরূপণে রিপোর্টটি রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এটাই স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের কৃষি পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান। এর আগে এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট না থাকায় ভবিষ্যৎ নীতি প্রণয়নের অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখন সে সমস্যাটি আর রইল না। এর জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মোবারকবাদ জানাই।